দৈনিক
ইত্তেফাক

24 JUL 2017

এমপিওভুক্তির আওতা বাড়াইতে হইবে

শিক্ষক এমপিওভুক্তিতে বিস্তর অনিয়ম নিয়া গত শনিবার দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদন। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, এমপিওভুক্তি লইয়া চলমান হাহাকার এখনও দূর হয় নাই। চাহিদামাফিক এমপিও দিতে না পারাটাই এই সংকটের মূল কারণ। দেশে বর্তমানে সাড়ে সাত হাজারের অধিক নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় সোয়া লাখ শিক্ষক এমপিও হইতে বঞ্চিত। নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া থামিয়া আছে। ফলে এইসব শিক্ষকের ভাগ্যের দুয়ার খুলিতেছে না। তাহারা পরিবার-পরিজন লইয়া মানবেতর জীবন যাপন করিতেছেন। শিক্ষকদের এমপিও তথা মাস্থলি পে-অর্ডার বা বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের চল আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে বহুদিন যাবৎ। এখন এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করা হইবে কেন? যদি বন্ধ থাকে, তবে মাঝেমধ্যে তাহা আবার দেওয়া হইবে কেন? আবার এই প্রশ্নও উঠিতে পারে যে, সরকার আর কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আর কত শিক্ষককে এমপিও দিবে?

প্রকৃতপক্ষে এমপিও প্রদানের মাধ্যমে সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের উদ্যোগকেই ত্বরান্বিত করে। সম্প্রতি ব্যাপকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কিছু স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করা হইয়াছে। সাধারণত এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই জাতীয়করণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমে ব্যক্তি বা জনগণের চাঁদা বা অনুদানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিলেও একটা পর্যায়ে ভবন নির্মাণ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শিক্ষকদের এমপিও প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। সেই প্রতিষ্ঠানও কতগুলি সরকারি বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এমপিও হিসাবে শিক্ষকদের আসলে মূল বেতন ও তৎসঙ্গে সামান্য বাড়িভাড়া ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়। আর জাতীয়করণকৃত বা সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ মূল বেতনের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে বাড়িভাড়া, যাতায়াত ও মেডিক্যাল সুবিধাসহ সবরকম সুবিধাই পাইতেছেন যথারীতি। এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সরকারিকরণ করিলে সরকারের খুব বেশি যে খরচ হইবে তাহা নহে। এইজন্য অনেকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের পক্ষপাতী। কিন্তু সমস্যা আছে অন্যত্র। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যেসব স্কুল-কলেজ চলিতেছে, তাহারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার মান মোটামুটি ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে বটে, কিন্তু সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ালেখার মানের বলিতে গেলে তেমন কোনো উন্নতিই নাই। এখানে একজন শিক্ষককে বেশিদিন ধরিয়াও রাখা যায় না। যখন-তখন বদলি হইয়া যান। তাই সক্ষমতা থাকিলেও সরকার ঢালাওভাবে জাতীয়করণেরও সিদ্ধান্ত নিতে পারিতেছে না।

ধনী লোকের ছেলে-মেয়েরা আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কিংবা বিদেশে পড়াশুনা করে। ফলে তাহারা আমাদের এখানে পড়াশুনা করিয়া পর্যাপ্ত বেতন ও ফি দিয়া স্কুল-কলেজগুলির শ্রীবৃদ্ধিতে যে অবদান রাখিবেন, তাহারও সুযোগ কম। বিদেশের অনেক নামিদামি স্কুল সচ্ছল শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে মোটা অঙ্কের বেতন-ফি পাইয়া থাকে। তাহারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও সাবেক শিক্ষার্থী হিসাবে তাহারা আজীবন ডোনেশনও দেয়। এমন প্রথা আমাদের দেশে চালু হয় নাই বলিয়া এখানে এখনও সরকারই প্রধান ভরসা। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি, শুধু এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নূতন শিক্ষকের এমপিওভুক্তি নহে, সারা বৎসর জুড়িয়া কমবেশি নূতন নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও এমপিওভুক্তি অব্যাহত রাখা উচিত। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও মানদণ্ড বিবেচনায় নিয়া নূতন এমপিও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যাইতে পারে যাহাতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে। এমপিওভুক্তি নিয়া অনিয়ম বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ২০টি টিম গঠন করিয়া দিয়াছে। দেখা যাক, তাহারা এইক্ষেত্রে কতটা শুদ্ধতা আনয়ন করিতে পারেন।